প্রতিধ্বনি the Echo
Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed Indexed International Journal of Humanities & Social Science
Published by: Dept. of Bengali
Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: https://www.thecho.in
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)

পদ্মানদীর মাঝি : একটি জনগোষ্ঠীর আত্ম-পরিচয় ও আর্থ-সামাজিক সংকটের ইতিকথা

ড.তপন রায়
Ex-Post Doctorate Fellow, ICSSR, New Delhi, India

Abstract

Padmanadir Majhi is a treatise of the sorrows and happiness, troubles, helplessness and sexual existence of the fishermen residing on the banks of Padma. The novelist Manik Bandhapadhyay depicted a rational village picture of Bengal almost one hundred years ago. In this novel the hardship of life in rough natural environment, and the exploitation of the fishermen and their wishes are implicitly hidden. I, through this essay, want to highlight the self identification and social crisis of the people belonging to the lower rank of the society.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীজুড়ে এক গভীর মূল্যবোধের সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। সেই মূল্যবোধের সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য বাংলা কথাসাহিত্যে যারা যারা কলম ধরেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন বিস্ময়কর প্রতিভা । তার গল্প ও উপন্যাসে দেখা যায় শহুরে জীবনের পাশাপাশি গ্রাম্য জীবনের নানা বাস্তব ঘটনা ও সমস্যার কথা যেখানে তিনি অন্ত্যজ, শ্রমজীবী মানুষের লড়াই ও জীবন সংগ্রামকে সূক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করে নিপুন শিল্পীর ন্যায় জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। এমনই একটি উপন্যাস হল পদ্মানদীর মাঝি যেখানে প্রান্তিক বা অন্ত্যজ ধীবর শ্রেণির মানুষের সুখ-দুঃখের হাসি-কান্নার কথা ফুটে উঠেছে এবং স্পষ্টভাবে ধারা পড়েছে শেণিচেতনা ও সামাজ-মনস্তত্বের দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ তার মনে হয়েছে নিছক শিল্পের জন্য শিল্প নয়; শিল্প মানুষের জন্য, শিল্প জীবনের জন্য যার প্রতিফলন ঘটেছে পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে। উপন্যাসের প্লট রচনার ক্ষেত্রে কল্পনার থেকে বাস্তবতা বোধ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। প্লটের বিকাশ ঘটেছে পদ্মানদীর প্রেক্ষাপটে, যেখানে কেতুপুর ও তার সংলগ্ন কয়েকটি ছোট ছোট গ্রামে বসবাসকারি জেলেদের জীবনে সুখ-দুঃখ, পাওয়া-না পাওয়া,আনন্দ-বিস্ময়-হতাশার ব্যঞ্জনার চিত্র স্পষ্ট হয়েছে । এই নদীকে কেন্দ্র করে এখানকার বেশিরভাগ মানুষ জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করে। অর্থাৎ পদ্মায় হল তাদের বেঁচে থাকার একমাত্র আশ্রয়; জীবন-যাপনের প্রধান সহযোগি। তাই এই উপন্যাসকে আমরা 'রিভারলোর' হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। অতএব "নদীর ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাদের ভবিতব্য। কিন্তু সারা পৃথিবীর সাধারন মানুষের ক্ষেত্রে যা হয়, কেতুপুরের ধীবরদের বরাতেও সেই একই লিখন, তাদের উপার্জিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য পায় না সভ্য মানুষের পৃথিবীতে, তার ফলে বেঁচে থাকতে গিয়ে যে সংগ্রাম করতে হয় তা প্রায়ই নাড়িয়ে দেয় তাদের অস্তিত্ব"।[১] তাই গোটা উপন্যাস জুড়ে একটি বিষয় ঘুরে ফিরে এসেছে তা হল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কঠোর জীবন সংগ্রাম। উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ লক্ষ্য করলে দেখা যায় কেতুপুর গ্রামের ধীবরদের একটাই ঐশ্বর্য, একটাই অলংকার, একটাই অহংকার - সেটা দারিদ্র্যের। এই দারিদ্র্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবনের চড়াই ও উতরাই পথ বেয়ে কিভাবে তারা নিজেদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে বা রাখার চেষ্টা চালিয়েছে তার বর্ণনাই হল উপন্যাসের মূল বিষয়।

১. পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে ধীবরদের আত্ম-পরিচয়ের কথা : পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে প্রান্তীয় ধীবর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক জীবনের বিচিত্র রূপ ফুটে উঠেছে, যার মধ্যে ধরা পড়েছে তাদের জাতিগত, বৃত্তিগত ও সামাজিক পরিচয়। সামালোচক গোপীনাথ রায় চৌধুরী মন্তব্য করেছেন- "…..কেতুপুরের গ্রামীণ সমাজের বিভিন্ন ঘটনা ও চিত্রের মধ্য দিয়েও এই গোষ্ঠীজীবন আত্মপ্রকাশ করেছে"।[২] পদ্মার নদীতে মাছ ধরে ও মাঝিগিরি করে বেঁচে থাকার লড়াই তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। তারা চেষ্টা করে সংঘবদ্ধভাবে এই লড়াইয়ে শামিল হতে। অর্থাৎ তাদের ব্যক্তিগত সংগ্রাম উত্তোরিত হয় সমষ্টিতে। তাইতো পদ্মার বুকে দিনরাত কুবের, গণেশ ও ধনঞ্জয়ের মতো মাঝিদের যে সংগ্রাম তা সমগ্র ধীবর জাতির জীবন-জীবিকা অর্জনের সংগ্রামকে চিহ্নিত করে। গোটা উপন্যাসে এই জীবন সংগ্রামের মধ্যে ফুটে উঠেছে তাদের আত্ম-পরিচয় ও আর্থ-সামাজিক সংকটের কথা।

১.১ পেশাগত ভাষার পরিচয় : এই উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের মাঝিমল্লারদের পেশাগত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। যে ভাষায় কোন কথা নেই কেবল আছে কতকগুলি তরঙ্গায়িত শব্দ। এ ভাষা পূর্ববঙ্গের মাঝিরা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। এর সাধারণ অর্থ সকলের অজানা। বিশেষ পরিভাষিক অর্থে এর ব্যবহার হয়। সতর্ক কান ও বিশেষ দৈহিক ভঙ্গিমা ছাড়া এই ভাষা উপলব্ধি করা যায় না। এখানে আঞ্চলিক উপভাষার সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু লোকজ শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে।

১.২ পেশাগত পরিচয় : 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি একটি বিশেষ অঞ্চলের বসবাসকারি জেলেদের জীবন-জীবিকার সংগ্রামের কাহিনি। যাদের নিয়ে এই উপন্যাসের প্লট তাদের প্রধান জীবিকা হল হয় পদ্মায় মাছ ধরা নতুবা পদ্মার বুকে নৌকায় মাঝিগিরি করা -- আর এটাই হল তাদের ঐতিহ্যবাহী জীবিকা। নিম্ন বর্গের হিন্দু ও বেশ কিছু মুসলমান পরিবার নিয়ে এই বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। এদের প্রধান জীবিকা হল পদ্মার নদী থেকে মাছ সংগ্রহ এবং সেই মাছকে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা। এছাড়া কখনো কখনো পরের নৌকায় মাঝিগিরি করা। তবে এই বৃত্তি কেবল পুরুষদের নয়, বাড়ির মেয়েরাও এই বৃত্তির সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িত। উপন্যাসে তার পরিচয় পাওয়া যায়—"পুরুষেরা মাছ ধরিয়া আনে, পাইকারি কেনাবেচা করে, চুপড়ি মাথায় করিয়া বাড়ি বাড়ি মাছ যোগান দেওয়া তাদের কাজ নয়, ও কাজটা জেলে পাড়ার মেয়েরা সন্তান প্রসবের আগে-পিছে দু-একটা মাস ছাড়া বছর ভরিয়া করিয়া যায়।"

১.৩ বিশ্বাস-সংস্কার : অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রতি বিশ্বাস, ভয় ও আনুগত্য থেকে বিশ্বাস-সংস্কার ও লোকাচারের জন্ম হয়। পদ্মা তীরবর্তী মাঝিদের জীবন এই ধারণা থেকে ব্যতিক্রম নয়। কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে কাছে পাওয়া এবং অনাকাঙ্ক্ষিতকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তারা নানা বিশ্বাস-সংস্কার মেনে চলে। তাই এই উপন্যাসে দেখা গেছে জন্ম সংক্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মালা আতুড় ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন নদনদীবহুল পূর্ববাংলায় বাড়িতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হত এজন্য বাড়িতে আঁতুড় ঘর নির্মাণ করা হত। কিন্তু মালার আঁতুড় ঘর আর পাঁচটা ভদ্র মানুষের আঁতুড় ঘরের মতো নয়। মালার আঁতুড় ঘর হল—"নিচু দাওয়ার মাটি জল শুষিয়া শুষিয়া ওখানটা বাসের অযোগ্য করিয়া দিয়াছে, তবু এইখানের ভিজা স্যাঁতস্যেঁতে বিছানায় নবজাত শিশুকে লইয়া মালা দিবারাত্রি যাপন করিবে। উপায় কী ? যে নোংরা মানুষের জন্ম লাভের প্রক্রিয়া ।" এদের সমাজের মেয়েরা সংসারে অমঙ্গল হবে বলে 'নেই' বা 'না' শব্দের পরিবর্তে 'হ্যাঁ' সূচক শব্দ ব্যবহার করে, যেমন—গণেশের বৌয়ের মুখ থেকে শোনা গেছে 'চাল বাড়ন্ত'। আবার লক্ষ্মীবারে অর্থাৎ বৃহস্পতি বারে যে কাউকে চাল দিতে নেই সে সংস্কারও তারা মেনে চলে। কারণ তাদের ধারণা এতে ঘারের লক্ষ্মী বাইরে চলে যাবে। তবে হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে বাস করলেও তাদের মধ্যে ধর্ম সম্পর্কে গোঁড়া বিশ্বাস আছে , যেমন কোন মুসলমান ব্যক্তি বাড়ির কোন পাত্রে জল খেলে তবে তা শুদ্ধ করতে হবে। হোসেন মিয়া জল খাবার পর গোপি যা করেছিল। আবার গণেশের বউ উলুপী আমিনুদ্দির মেয়েকে ছুঁতে নেই যেনেও ছুঁয়েছিল। অতি প্রাকৃত ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যেও জাদু সংসারের প্রতি বিশ্বাস ছিল। এরই প্রতিফলন ঘটেছে ঝড়-বৃষ্টি বন্ধের জন্য ঘরে ঘরে মেয়েদের উঠানে পিঁড়ি পেতে দেওয়া সংস্কার পালনে। এর উদ্দেশ্য হল বৃষ্টির দেবতাকে সন্তুষ্ট করা। কারণ বিশ্বাস-সংস্কারের মূল কথা হল শুভাশুভোবোধ ও ঐহিক কামনা লাভ। এই ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে ঝড়ের কবল থেকে কুবেরের মুক্তির জন্য কপিলার মানদ করার মাধ্যমে। এখানে 'হরিলুট' প্রথার কথা বলা হয়েছে। দেবতার থানে গিয়ে ফল বাতাসা ছাড়ানোর প্রথা হল হরিলুট।

১.৪ বিবাহ রীতি : পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কুবেরদের সমাজে বিবাহে কন্যাপণ (**Bride Price)** নেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। কুবের তার মেয়ে গোপিকে বঙ্কুর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে পাঁচ কুড়ি টাকার পণ পেয়েছিল। এছাড়া গোপির বিবাহের সময় হিন্দু ধর্মের রীতি অনুযায়ী 'গায়ে হলুদ' নামক লোকাচার পালনের প্রথারও পরিচয় পাওয়া যায়।

১.৫ লোকউৎসব : এই উপন্যাসে জেলে পাড়ার মাঝিদের মধ্যে রথযাত্রা, দুর্গাপূজা ও দোল উৎসব উৎযাপনের পরিচয় মেলে। তারা রথযাত্রা উপলক্ষ্যে দল বেঁধে রথের মেলায় যায়, বউরা মেলা থেকে লাল পাছা পাড় শাড়ি কেনে। শুধু তাই নয়,নতুন কাচের চুড়ি এবং কাঠ ও কাচের পুঁতির মালাতে বাড়ির বউরা ণবরূপে সেজে ওঠে। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা মাটির পুতুল নিয়ে এবং বাঁশি বাজিয়ে আনন্দ উপভোগ করে। এছাড়া তারা মেলা থেকে নানা ধরনের ভোজ্যপণ্য কিনে আনে। কেতুপুরে দুর্গাপুজা না হলেও পূজার আনন্দ কিন্তু থেমে থাকেনা। দুর্গাপুজাকে উপলক্ষ্য করে ছেলে-বুড়ো সকলেই গ্রামে গ্রামে ঠাকুর দেখতে বের হয়, কেউ কেউ তাড়ি খেয়ে মাতলামি করে—নিম্ন শ্রেণির মানুষের এ এক আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। একই রকম ভাবে তাদের দোল উৎসবে মেতে উঠতে দেখা যায়। জেলে পাড়াতে রং কেনার পয়সা না থাকলেও কাদা নিয়ে রং খেলতে তাদের আসুবিধা হয় না। মেয়ে মরদ একে অপরকে গায়ে কাদা লাগিয়ে দেয়—এটাই হলো তাদের ভালবাসার রং। কুবের কপিলাকে জড়িয়ে ধরে এই ভালবাসার রং লাগিয়েছিল।

১.৬ লোকখাদ্য ও পাণীয় : পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসে কুবেরদের সমাজে একটা বিশেষ লোকখাদ্য 'ব্যানুন' রাঁধার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ব্যানুন খাসির মাথা কুচিয়ে তার সঙ্গে তেল, মরিচ ও অন্যান্য উপকরণ সহযোগে তৈরি হয়। তাদের মধ্যে লোক পাণীয় বলতে তালের রস দিয়ে তাড়ি এবং ভাত পচিয়ে এক প্রকার মদ তৈরির পরিচয় মেলে।

১.৭ লোকঔষধ : কুবেরদের সমাজে বেশ কিছু লোকঔষধ ব্যবহারের পরিচয় মেলে। শরীরের কোন স্থানে ব্যাথা পেলে তারা চুন আর হলুদ মিশিয়ে ঐ স্থানে লেপে দেয়। আবার ব্যাথা কমাতে তামাক পাতার ব্যবহার করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বালা যায় পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি একটি অন্ত্যজ লোকায়ত জীবনের আত্মকাহিনী। এখানে জেলে ও মাঝিদের গোষ্ঠী জীবনের বাস্তব চিত্রের সার্থক রূপায়ন ঘঠেছে। উপন্যাসের প্রথম দিকে কয়েকজন মিলে সংঘবদ্ধ ভাবে উত্তাল পদ্মার বক্ষ থেকে মাছ ধরার যে প্রচেষ্টা, তারপর তাদের বঞ্চিত হওয়ার যে কথা, তাদের সুখ-দুঃখ, দুর্দশা, হতাশা, তাদের বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-আচরণ এবং স্বভাব সবকিছু উপন্যাসে যেভাবে উল্লেখিত হয়েছে তা দেখে মনে মনে হয় গোটা উপন্যাসটাই তাদের গোষ্ঠী জীবনের উপকথা ; তাদের বংশ পরম্পরায় বয়ে আসা ঐতিহ্যের এক প্রত্ন নিদর্শন।

২. আর্থ-সামাজিক সংকট : কেতুপুর, চরডাঙা ও ময়নাদ্বীপের ধীবরদের দৈনন্দিন জীবনের নানা টানাপোড়েন ও দুঃখ- দুর্দশার এক সার্থক রূপচিত্র হল পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাস। এখানে তাদের জীবনের নানা সংকটের কথা উল্লেখিত হয়েছে। ময়নাদ্বীপ থেকে রাসুর পালিয়ে আসার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেতুপুরের মাঝিদের মধ্যে অস্তিত্ব রক্ষার একটা গভীর সংকট দেখা গেছে। পীতম মাঝির ঘরে বিচার সভায় কুবের, আমিনুদ্দি, নকুল, রাসুকে দেখে মনে হয়েছে সকলেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কিন্তু আর্থ-সামাজিক টানাপোড়েনের চাপে সবাই ভীরু ও নিরুপায়। তবে বঞ্চনা হওয়া এদের জীবনের একটা প্রথা-- আর এই বঞ্চনা হল শ্রম ও শ্রমের মূল্য নিয়ে। তাই তাদের জীবনে এত সংকট। কারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রধান সম্পদই হল শ্রম। এই কারণেই কুবেরের মত শ্রমজীবী মানুষকে শরীর অসুস্থতার মধ্যেও মাছ ধরতে যেতে হয়। শরীর থাক আর যাক তা নিয়ে তার কনো মাথা ব্যাথা নেই।

তাদের অবস্থা এতটাই সংকটময় যেখানে অন্ন , বস্ত্র ও বাসস্থান এই তিনটি মৌল চাহিদা মেটাতে হিমসিম খেতে হয়। তাই "জেলে পাড়ার ঘরে ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনদিন বন্ধ হয় না। ক্ষুধাতৃষ্ণার দেবতা, হাসিকান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা , ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না"। শুধু তাই নয় ঝড়, বৃষ্টি ও শীতের হাত থেকে রেহায় পাওয়ার মতো বাসগৃহ তাদের কারোর নেই। তাদের জীবন এতটাই দূর্বিসহ যেখানে জন্ম, রোগ ও শোকের অভিব্যক্তি প্রায় একই রকম। তাদের জীবন কেবল ক্ষুধা, পিপাসা, কাম, মমতা, স্বার্থ , স্বার্থপরতা ও দেশি মদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

উপন্যাসের ঘটনা প্রবাহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আর্থিক দুরবস্থার কারণে মাঝিদের জীবন ওলট-পালট হয়ে গেছে। আর্থিক অনাটনের কারণে কুবের যৌথ ভাবে সংগৃহীত মাছের ভাগ থেকে গোপনে মাছ সরিয়ে শেতলবাবুকে বিক্রি করেছে, হোসেন মিয়ার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছে। তবে কুবেরের এই স্বভাব পেশাগত নয়, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির চাপে নিয়ন্ত্রনহীন এক আদিম প্রবৃত্তির(লোভ) বহিঃপ্রকাশ। কুবেরের আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে বৃষ্টির সময় ঘরের চাল ফুটো হয়ে জল পড়ে। খড়ের অভাবে ঘরের চাল ছেতে পারেনা। আসলে সে জেলে পাড়ার গরিবের মধ্যে গরিব। অনাহারের কারণেই রাসুর মতো যুবককে ঘর ছাড়া হয়ে ময়নাদ্বীপে যেতে হয়েছে এবং স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা হারা হয়ে এক অনিশ্চিত জীবনে প্রবেশ করেছে। পরবর্তিতে অর্থের কারণে গোপিকে ভালোবেসেও কাছে পেতে পারেনি। উপন্যাসের আর বাকি চরিত্রগুলির অধিকাংশকেই একই রকম আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে। তাদের মধ্যেও জীবন ধারণের রসদ সংগ্রহ ও জীবিকার অনিশ্চয়তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এই উপন্যাসে জেলে মাঝিদের পেশাগত জীবনের গভীর সংকট লক্ষ্য করা গেছে। কুবের, রাসু ও আমিনুদ্দির মতো মাঝিরা তাদের জাত পেশা ত্যাগ করে ময়নাদ্বীপে বসবাস করতে গেছে। অর্থাৎ তাদের পেশাগত পরিচয় পরিবর্তিত হয়েছে, যা তাদের বৃত্তিগত পরিচয়ের এক সংকটময় অধ্যায়।একই সঙ্গে সামাজিক জীবনের নানান সংকট এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। গরিবের ঘরে পুত্র সন্তান জন্মানোর মতো আনন্দ অন্নাভাবের তাড়নায় চাপা পড়েছে। শুধু তাই নয়, অন্ন ও আর্থের অভাবে তাদের মধ্যে হিংসা, স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতা বোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। পারস্পরিক হিংসার করণে কুবেরের ফর্সা ছেলেকে দেখে নকুল গ্রামের মধ্যে কুবেরের বউ-এর সঙ্গে মেজবাবুর একটা অবৈধ সম্পর্কের ঘটনা তৈরি করার চেষ্টা করেছে। তবে একথা সত্য না হলেও আদিম প্রবৃত্তির উদ্দাদনা কুবেরের পারিবারিক জীবনে এক গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কুবেরের জীবনে এই আদিম প্রবৃত্তির সঙ্গে সংঘাতের অন্যতম কারণ হল—কপিলার প্রতি কুবেরের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা আসক্তি। একদিকে পদ্মার উত্তাল রূপের মতো কপিলার উদ্দাম যৌবন আর অন্যদিকে অসহায় পঙ্গু মালার প্রতি ভালোবাসা - এই দুই কামনা ও কর্তব্য বোধের মধ্যে কুবের কোনটাকে বেছে নেবে তা নিয়ে তার মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত তৈরি হয়েছে। কাহিনির পরিণতিতে দেখা গেছে কুবেরের আদস (Id) অহং (Ego) দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। তার নৈতিকতা বা আধিশাস্তার (Super Ego) পরাজয় ঘটেছে। ময়নাদ্বীপের রহস্য তাদের জীবনে একটি অন্যতম সংকটময় অধ্যায়। কারণ এই ময়নাদ্বীপ হল মৃত্যু ও বন্য জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকার শেষ আশ্রয়। এই দোলাচলচিত্ততা থেকে তারা অনেকেই বেরিয়ে আসতে পারেনি। সবশেষে একথাই বলা যায় পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি পূর্ববঙ্গের পদ্মাপারের কয়েকটি ছোট ছোট গ্রামের বৃত্তিজীবী ধীবর গোষ্ঠীর সামাজিক ঐতিহ্য ও গোষ্ঠী জীবনের নানা সমস্যার এক প্রমাণিক দলিল। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে বলেছেন—" এই উপন্যাসটির সর্বশ্রেষ্ঠ গুন হইতেছে ইহায় সম্পূর্ণরূপে নিম্নশ্রেণী অধ্যুষিত গ্রাম জীবনের চিত্রাঙ্কনে সূক্ষ্ম ও নিখুঁত পরিমিত বোধ, ইহায় সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে সনাতন মানব প্রবৃত্তিগুলির ক্ষুদ্র মৃদু উচ্ছ্বাসের যথাযথ সীমা নির্দেশ"। উপন্যাসের প্রথম দিকে এই গোষ্ঠী জীবনের ছায়া প্রগাঢ় হলেও ক্রমঃশ তা গোষ্ঠী থেকে ব্যষ্টিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে কুবেরের পারিবারিক জীবন পট যতই বিস্তৃত হোক না কেন তা কখনোই গোষ্ঠী জীবনের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।

তথ্যসূত্র :

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন, ২০০৯, অন্ত্যজ জীবনের ইতিকথা, পশ্চিমবঙ্গ, ৪২ বর্ষ (৬-৯), পৃ-১২২।
২. রায় চৌধুরী, গোপীকানাথ, ২০০৮, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় জীবন দৃষ্টি ও শিল্পরীতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা পৃ-৭৯।

*****